৬

কলকাতায়ে থাকতে একদম খাঁটি বাঙালী ছিলাম ও এখন এই প্রবাসেও তাই আছি। তবে এখন বাড়িতে বাংলায়ে কথা বললেও, অফিস কাছারিতে ও প্রতিবেশিদের সাথে অবশ্য হিন্দি ও ইংরেজি কথার চলই বেশি। কলকাতায়ে বাড়িতে ও পাড়ায়ে চিরকাল বাংলা কথাই বলে এসেছি। এমনকি এমনও মনে পড়ছে যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অতিশয় পাকা ও লায়েক কোন বন্ধু অথবা গড়িয়াহাট বালিগঞ্জ এলাকার কোন ট্যাঁশ গোছের সুশ্রী বান্ধবী যদি ইংরেজীতে ফটর ফটর বুকনি ঝাড়তো, তখন মিত্রতা ও অনুরাগের চেয়ে রাগই বরং হত বেশি। তা সেসব সঙ্গ খুব সাঙ্ঘাতিক প্রয়োজন না হলে, একটু তফাত করে এড়িয়ে চলাই শ্রেয় মনে করতাম শুধুমাত্র ইংরেজি বলার আশঙ্কায়ে। ইংরেজি ভাষাটি গড়গড় করে পড়ে ফেলতে বা লেখার বেলায় বেশ ভালো রকমের পারদর্শীতা ও নৈপুণ্য থাকলেও, ভাষা'টি মুখে বলতে গেলেই কেমন যেন গড়পড়তা আর পাঁচটি বাঙালীর মতন ঘাবড়েই যেতাম সবসময়। এই 'ইঙ্গ' বনাম 'বঙ্গ' দোষটি কিন্তু আজকের নয়। এ দোষ বাঙালীর অনেকদিনের। (এমনকি টেনিদার আমলেও খুব বেশি ছিল। 'চামচিকে ও টিকিট চেকারের' গল্প ছেলেবেলায়ে যে পড়েছে, সে বেশ বুঝবে)।

উচ্চারন তো বাদই দিলাম। বাঙালীর মুখে এমন কিছু ইংরেজি শব্দ আমি শুনেছি, যা কিনা কোনকালেই ভুলবার নয়। ব্যাঙ্কের 'ভল্ট'কে কলকাতার বাঙালীরা বলেন 'লকার', আর সেই 'লকার'কেই 'লক-আপ' বলতে শুনেছি অনেক বাঙালিকেই। যেমন কিনা ইংরেজির 'রেসিস্টেন্স' শব্দটি। যে কোন বাঙালী মামুলি আমজনতার পক্ষে 'রেসিস্টেন্স' শব্দটির অর্থ বোঝা বেশ মুশকিলের, কিন্তু তা বলে অনায়াসে রেসিস্টেন্সকে 'রেজিস্ট্রেশন' বলে দেওয়া, এ বোধহয় কেবল বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব। অসুখ থেকে উঠলে অনেককেই বলতে শুনেছি, "আহা রে, ওষুধপত্তর খেয়ে খেয়ে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার টা একদম কমে গিয়েছে গো"। ত্বক'কে 'লেদার' বলতেও তো শুনেছি আমি অসংখ্যবার। কমবয়সে, মুখের চামড়ায়ে কোনরকম ব্রন-ফুসকুড়ি হলে, আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ির এক বয়ঃজেষ্ঠ কাকাস্থানীয় ব্যক্তি আমাকে নিয়ম করে 'লেদারের' যত্ন নিতে বলতেন। যতবার তার সাথে মুখোমুখি হয়েছি, ততবার। আবার এই তো সেদিন আমার শ্যালকের মুম্বইস্থিত কোম্পানী'তে একটি রীতিমত ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা বাঙালী যুবকের মুখে অত্যন্ত বিরক্ত সহকারে বলতে শোনা গিয়েছে, "হিজ চেয়ার ইজ নট দেয়ার"। বেচারি অফিসের ফোনে হয়তো কোন মক্কেলকে ইংরেজিতে বোঝাতে চেয়েছিলেন, যে মক্কেল ভদ্রলোকটি যার খোঁজ করছেন, সেই ভদ্রলোকটি সেই মুহূর্তে তাঁর আসনে নেই, অন্যত্র কোথাও গিয়েছেন হয়তো। এবং শুধু তাই নয়, শ্যালকের মুখেই শুনলাম, কথাটি নাকি বলা হয়েছে অত্যন্ত আক্রমনাত্মক ও মারমুখি সুরে। স্থান কাল পাত্র কিছু মাত্র বিচার না করেই। বাঙালী যুবকটির এই বিরক্তি কিন্তু তার সেই আসনে না বসা লোকটির উপরেও নয়, আবার যে মক্কেল ফোনটি করেছেন তাঁর উপরেও নয়। এই চড়া মনোভাবটি'র পিছনে কিন্তু রয়েছে যুবকটির সাবলীল ইংরেজি বলার অক্ষমতা। ফোনের বাক্যালাপে ওই ইংরেজি মার্কা প্রতিকূল অবস্থা'র সামাল দিতেই বুঝি এত রাগ আর চরম বিরক্তি।

আদতে, কোন বাহ্যিক কথোপোকথনের সময়ে, মনের মধ্যে সর্বসময় এক একটি বাংলা বাক্য ধরেধরে ম্লেচ্ছভাষায় অনুবাদ করে যাওয়া ব্যাপারটি শুনতে সহজ হলেও, কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা যে কতটা শ্রমসাধ্য ও দুরুহ, সে একমাত্র আমার মতন অকৃত্রিম বাঙালীরাই বুঝবেন। আমাদের সময়ে ইস্কুলে অতটা অসুবিধা ছিলোনা। দু'চারজনকে বাদ দিয়ে বাকী স্যারেরা তো বটেই, এমনকি আমাদের খ্রীষ্টান ইস্কুলের সাহেব পাদ্রী ফাদারেরাও ভাঙাভাঙা বাংলা'য় কথা বলতে পারতেন। অসুবিধার শুরু হয়েছিল আমার ওই সাহেবী কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই। ইস্কুলে টানা বারো বছর নিস্তেজ বাঙালী হয়ে কাটিয়ে, কলেজের প্রথম দিকটায় তো চরম উদ্বিগ্ন হয়েই সময় কাটাতে হত। অ্যাকাউন্টেন্সি বা বানিজ্যিক বিভিন্ন বিষয়গুলি ও বিশেষ করে আইন, কলেজের প্রফেসরেরা ইংরেজীতেই পড়াতেন। তাছাড়া ক্লাসে ছিল অসংখ্য মারোয়ারী, শিখ পাঞ্জাবি, সিন্ধী, গুজরাটি এবং বহুসংখ্যক দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্র। তদতিরিক্ত, মুষ্টিমেয় কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ানস। কিছু বাঙালী ছাত্রও এমন ছিল যে প্রথম মাসদুয়েক টুকটাক কথা বলেও বুঝে উঠতে পারিনি যে ছেলেটি আসলে আমারই মতন খাঁটি বঙ্গসন্তান। মুলত হিন্দিতেই কথা বলত তারা। অবশ্য সে সময়ে কলেজে ইংরেজি বলা শেখার আগেই, ইংরেজী ভাষার বেশ বাছা বাছা কিছু অশ্রাব্য কুবচন ও গালাগালি শিখে নিয়েছিলাম অচিরেই।

বাবা মা কিন্তু ছোট থাকতেই পইপই করে রোজ বলতেন ইংরেজি শেখার উপকারিতার কথা। কিন্তু মুখে বলার চেয়ে লেখার ব্যাপারেই জোর দিতেন বেশি। আর ইংরেজি শেখার ব্যাপারটি খুব বেশি করে হত ‘রোববারে’। খুব মনে পড়ছে, প্রতি রোববার রোববার বাবা আমার জন্য উলটো দিকের কোয়ালিটি রেঁস্তোরা'র ফুটপাথের কাগজের স্টল থেকে কিনে নিয়ে আসতেন ‘দি সানডে স্টেটসম্যান’। আমিও কিনে এনেছি অনেকবার। বাবা’কে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন কেউ একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন, রোববারের স্টেটসম্যান পত্রিকা’র সম্পাদকীয় পড়লে নাকি ছেলের ইংরেজি ভাষার উপর দখল দৃঢ় হবে ও একইসঙ্গে ছেলের চিন্তাভাবনাও হবে যথাযথরূপে বলিষ্ঠ। সে হবে গিয়ে তখন ১৯৮৭ সাল। ঢাকুরিয়ার পাট বছরতিনেক হল তুলে দিয়ে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে উঠে এসেছি আমরা। বাবা ছিলেন চিরকালই ঘরকুনো আর মাঝখানে আচমকা আমার জ্যাঠামশায়ের অকালমৃত্যু বাবাকে তখন আরও বেশি করে ঘরকুনো করে দিয়েছিল। সেই ৮৭ সালে তখন আমার মাধ্যমিক পরীক্ষাও শেষ, মা মন দিয়েছেন তাঁর পাঁচ বছরের ছোট শিশুপুত্রটির দিকে আর আমার বাবার বোধহয় হঠাৎ করে মনে হয়েছিল, বড়'টি বেশ বড় হয়ে উঠেছে, এবার তাকে একটু একটু সময় ও অভিভাবন দিয়ে, পথপ্রদর্শন করাই উচিত। রোববারের সকাল বেলায় একাধারে ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্র পাঠের মধ্য দিয়েই বসত বাপ ছেলের একান্ত আলাপচারিতা। বাবার মুখের সামনে খোলা থাকত তার প্রিয় আনন্দবাজার পত্রিকা ও আমার সামনে সানডে স্টেটসম্যান। তাতে আমার ইংরেজি শিক্ষা কতটুকু হত বলতে পারিনা, তবে ছেলে যে স্টেটসম্যান পত্রিকা পড়ছে, এটুকু দেখেই আমার অতিবাঙালী ঘরকুনো বাবা মনে মনে আহ্লাদিত হয়ে পড়তেন। আমি অবশ্য যত না সম্পাদকীয়'টি পড়তাম, তার থেকে বেশি নজর করতাম আজহারউদ্দিন আরো কটি সেঞ্চুরি মেরেছে ও আমারই বয়েসি একটি মারাঠি বালক কিরকম ভাবে মুম্বইয়ের শিবাজি পার্ক শাসন করছে, সেই খবরে।

আর সে সব রোববার সকালে, কথাপ্রসঙ্গে আমার নিতান্ত রাজনীতি উদাসীন বাবার মুখে মাঝে মধ্যেই শুনতে পেতাম তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী'র স্তুতি। সে সময়ে বফর্স ঘুষ কেলেঙ্কারি তে রাজীব সদ্য বিপাকে পড়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দিরাত্তোর যুগে একমাত্র রাজীব গান্ধীই যে ভারতের মুখ ভবিষ্যতে উজ্জ্বল করতে পারবেন, সে ব্যাপারে আমার বাবা ছিলেন একেবারে নিঃসন্দেহ। ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে সুইডিশ রেডিওয়ে বফর্স জাতীয় অমন একটা গোপন খবর বাজারে ছেড়ে দিয়ে খুব আলোড়ন তৈরি করে ফেলেছিল। অধিকন্তু, পত্রিকায়ে পড়েছিলাম, যে ভারত সরকারের সঙ্গে সেই বফর্সের ব্যাবসায়িক লেনদেনে দালালি করেছিলেন ‘কুত্রচ্চি’ নামক এক ইতালিয়ান দালাল। আর ইটালি বলতেই যে একেবারে রাজীব গান্ধীর ‘শ্বশুরবাড়ির’ ব্যাপার সেটি একাধারে স্টেটসম্যান ও আনন্দবাজারে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। আমার বাবার মতন অনেকেই তখনকার দিনে বিশ্বাস করতেন যে রাজীব কোন দোষই করেননি, যতই বা তার বিবাহিতা স্ত্রী’টি খাঁটি ইতালিয়ান হন না কেন। অনেকেই দাবি করে বসতেন, যে রাজীবের রাজনীতিতে আসাই তো একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আর প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ভারতবাসীই তো তখন জানতেনই না ইন্দিরা গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি দেখতে কেমন? ১৯৮০ সালে বিমান দুর্ঘটনায়ে সঞ্জয় গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যু’র পর ওঁর শবদেহ দাহ করার সময়ে ভারতের পত্রিকায়ে ও টেলিভিসনে প্রথম আবির্ভাব রাজীবের। আর তারপর তাঁর মায়ের চরম সাধসাধিতেই শুনেছি ওঁর রাজনীতিতে পদার্পণ। সঞ্জয়ের মৃত্যুতে ফাঁকা হয়ে যাওয়া উত্তরপ্রদেশের খ্যাতনামা ‘আমেঠি’ আসনটিতে, কংগ্রেসের কে দাঁড়াবেন, সে নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরেও কোন আলোচনা ও জল্পনা করতে দেননি শ্রীমতী গান্ধী। সেই প্রথম এলেন রাজীব, রাজনীতির আঙ্গিনায়ে। বলা যায় একরকম মায়ের আঁচল ধরেই। আর তারপরে যতসামান্য জনসংগঠন, একদুই বার রামলীলা ময়দান, ১৯৮২ সালের এশিয়াডের ব্যবস্থাপনা, এইসব করতে না করতেই ১৯৮৪ সালেই রাজীবকে বসে পড়তে হয়েছিল খাস প্রধানমন্ত্রীর আসনে। শিখ দেহরক্ষীদের হাতে ইন্দিরার খুন হওয়ার পর। সেই সময়ের অমৃতসরের গোল্ডেন টেম্পল, অপারেশান ব্লু-স্টার, খালিস্তান ও শিখ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গোচিত বিষয়ে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ তো অনেক রচনা-টচনাও লিখতে দিয়েছিলেন, বলে মনে পড়ে আমার।

তবে ১৯৮৪ থেকে নিয়ে ১৯৮৮ পর্যন্ত ওই অদম্য শিখ আন্দোলন খর্ব করার ব্যাপারে, রাজীব গান্ধী বোধহয় নরসিমা রাওয়ের পথনির্দেশনে বেশ কিছু সুবিবেচিত ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ১৯৮৪ তে সরকার গঠন করার সময় আবার ওই নরসিমা রাওয়ের কুবুদ্ধিতে অবশ্য প্রনব মুখোপাধ্যায় ও গনিখান চৌধুরী কে মন্ত্রীসভায় না নেওয়াতে, আমার বাবা সহ গোটা বাঙালী সম্প্রদায় রাজীবের উপর বেশ খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন

বলেই মনে পড়ছে। তবে রাজীব, নরসিমা রাওয়ের হাতে প্রতিরক্ষা ও বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের হাতে অর্থ দপ্তর ছেড়ে দেওয়াতে সাধারণ বাঙালিদের বেশ খুশি হতে দেখেছিলাম। তবে পরবর্তী কালে, সেই বিশ্বনাথ প্রতাপ ১৯৮৭ সালেই হবে বোধহয়, নরসিমা রাও এর হাত থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পরই তো বফর্স কেলেঙ্কারির সুচনা। তবে অর্থমন্ত্রী থাকা কালীন, বিশ্বনাথ প্রতাপের অর্থ সঙ্ক্রান্ত বেশ কিছু তাৎপর্যময় ও স্থিরবুদ্ধি নির্ণয় সকলকে বেশ খুশি করেই দিয়েছিল। এখন মনে পড়ছে, লাইসেন্স প্রথার ধীরে ধীরে শিথিলকরণ তার মধ্যে অন্যতম একটি দু:সাহসিক বিচার ও সেই আশির দশকের শেষভাগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা। তাতে অবশ্য রাজীবের স্নেহধন্য প্রশ্রয় ছিল বলেই এখন বুঝতে পারি। এ ছাড়াও মুলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে রাজীবের কিছু বৃহত্তর পদক্ষেপ আমার এখনও মনে পড়ে। 'ইনোভেসন' আজকের দিনের একটি অধিকচর্চিত কর্পোরেট বুলি। আর সেই আমলেই কিনা রাজীব কোন এক বিদেশি কোম্পানী থেকে স্যাম পিত্রদা'কে ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন গৃহজাত ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগব্যবস্থায়ে নতুন প্রথা ও পরিবর্তন আনতে। দিন বদলাচ্ছিল ধীরে ধীরে। বাঙালীর তখন ঘরেঘরে টেলিফোন এসে যাচ্ছে তড়িঘড়ি আর আমার দীনহীন বাবা মা'ও সকাল সন্ধ্যে ফোন করেই গপ্প করে চলেছেন ওই বাচ্চুমামু-টামু দের সাথে। আড্ডা মেরে দেরি হলেই টুক করে মা'কে একটি ফোন করে দিলেই সাত খুন মাফ। খুব মনে আছে আমাদের আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ির প্রথম লাল রঙের টেলিফোনের নম্বরটি ছিল ৭৪-৯৪১৬।

রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বিশ্বনাথ প্রতাপের ঝামেলাটি লাগে খুব সম্ভবত ধিরুভাই আম্বানির ও অমিতাভ বচ্চনদের বাড়িতে পুলিসের অপ্রত্যাশিত হানা দেওয়ার পরপরই। ১৯৮৭ সালে তো ধিরুভাইয়ের 'ওনলি ভিমল' ও আরও অনেক প্রকারের বানিজ্য ফুলেফেঁপে একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ ধরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল (এখনও অবশ্য তাই আছে)। ১৯৮২ সালে রিলায়েন্সের রাইটস ইস্যু ও ধিরুভাইয়ের মুম্বই ও কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের উপর অসীম প্রতিপত্তি তাঁকে রাতারাতি বিত্তশালী করে তুলেছিল। এমনকি ১৯৮৭ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের নামও দে'য়া হয়েছিল 'রিলায়েন্স কাপ' ও সেই সময়ে এমন কোন বিখ্যাত ক্রিকেটার ছিলেননা, যিনি কিনা টেলিভিসনে রিলায়েন্সের বিজ্ঞাপন করেননি। তা সে স্বয়ং ভিভ রিচার্ডসই হন বা অ্যালান বর্ডার। সেই সব ঝামেলাতেই বোধহয় বিশ্বনাথ প্রতাপ কংগ্রেস ছেড়ে বেড়িয়ে একদা রাজীব ঘনিষ্ঠ অরুন নেহেরু'র সাথে শুরু করেন জনতা দল। আর তার পরেই, জনমোর্চা, অসমের অগপ, দক্ষিণের তেলেগু দেশম ও করুনানিধির পার্টি ডিএমকে ও আরও কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল মিলে শুরু করা হয় 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'। আর সেই সময় থেকেই বোধহয় শুরু হয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির দাদাগিরি যা কিনা এখন 'দিদিগিরি'তে গিয়ে ঠেকেছে।

রাজীব গান্ধী নিজে কাশ্মীর সমস্যার কতটা সমাধান করেছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে সে সময়ে ১৯৮৮ বা ৮৯ নাগাদ আমরা সপরিবারে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম ও বেশ নিরুপদ্রবে ঘুরে এসেছিলাম বলে মনে পড়ছে। তবে এতকিছু সত্ত্বেও, রাজীব গান্ধী ১৯৮৯ এর সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। সব রাজ্যগুলিতেও তখন একধারসে অকংগ্রেসি সরকার। এবং দুম করে জাতীয় রাজনীতির সামনের সারিতে এসে বসলেন একদম আনকোরা নতুন কিছু আঞ্চলিক মুখ। সেই প্রথম আমরা জানতে পারি এমন কিছু নাম যারা কিনা এই বছর খানেক আগেও 'মোদীপুর্ব' ভারতের রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন যখন তখন। বিহারের লালুপ্রসাদ, উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম, অসমের প্রফুল্ল মহন্ত, অন্ধ্রপ্রদেশের এন টি রামা রাও ও ওড়িশায়ে বিজু পট্টনায়কের নাম তখন ভারতবাসীর ঘরে ঘরে। আর সেই সময়ে নাগাদ, কাউকে কিছু না বলেকয়ে, সবাই কে বেশ চমকে দিয়েই বিশ্বনাথ প্রতাপ নিয়ে এলেন 'মণ্ডল কমিশন'। ১৯৭৯ এর মোরারজি দেশাইয়ের বস্তাপচা সামাজিক সংরক্ষণের নিয়ম যে আবার ১৯৯০ ফেরত চলে আসবে তা কেই বা জানত? খুব মনে আছে, কেন্দ্রসরকার মণ্ডল কমিশন নিয়ে আসাতে সারা ভারতের কলেজপড়ুয়া যুবসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পরেছিল। আমাদের ইংরেজিপ্রধান অরাজনৈতিক কলেজ থেকেও বেশ কয়েকটি মিছিলে খুব স্লোগান-টোগান দিতে দিতে পার্ক স্ট্রিট ক্যামাক স্ট্রিট দিয়ে বারকয়েক হেঁটেছি বলে মনে পড়ছে। বিশ্বনাথ প্রতাপের প্রধান মন্ত্রিত্ব বছরখানেক বোধহয় টিকেছিল, না কি বুঝি আরও কম। আর সেই সুযোগের সঠিক সময়ে সঠিক সদব্যাবহার করেছিলেন বিহারি নেতা চন্দ্রশেখর। খুব সম্ভবত মনে পড়ছে, রাজীবও সেই সময়ে চন্দ্রশেখরকেই সমর্থন করেছিলেন। তা উনিও তো বেশিদিন টিকে ছিলেননা গদিতে।

আশির দশকের শেষভাগ, নব্বই একানব্বই এর গল্প তো আগেই অনেক বলেছি। গড়িয়াহাট পাড়ার আড্ডা, গান, গল্প, বন্ধুবান্ধব (ও বান্ধবী) ছাড়াও খুব মনে পড়ছে তিনটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এক, ১৯৮৯ এ সেই একদা শিবাজি পার্ক কাঁপানো মারাঠী বালক সচিন তেন্ডুলকরের করাচীর মাঠে অভিষেক। দুই, ১৯৯০ সালে আমার ছোটমাসি 'বন্ধু' র সুবীর কাকুর সঙ্গে বিয়ে ও তিন, ১৯৯১ এ আমার জ্যাঠতুতো দিদির রীতিমতন ধুমধাম করে সিক্কা প্যালেসে বিয়ে। বন্ধু'র বিয়ে ও সচিনের করাচী টেস্ট ছাড়াও, দিদির বিয়ের কয়েকদিন আগেপরেই সে সময়ে নাগাদ রাজীব গান্ধীর আপতিক মৃত্যু'টি আমার মনে আছে খুব বেশি রকম ভাবে। তবে দিদির বিয়ের চাপা উত্তেজনা ও চিন্তায়ে আমার রাজীবভক্ত বাবাকে খুব একটা শোক করতে দেখেছিলাম বলে মনে পরছেনা। ওই পরপর দুটি বিয়ে মোটামুটি ভাল ভাবে সম্পন্ন করে, আমার বাবা নিজেকে খুব গর্বিত মনে করতেন বলেও খুব মনে পড়ে।

১৯৯১ সালেই প্রথম, লোকসভা নির্বাচনের ভোট দিই আমি। রাজীব গান্ধীর মৃত্যু ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে, গোটা দেশ তখন কংগ্রেসের পক্ষে ও জনতা দলের ঘোর বিপক্ষে। রাজীবের মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের হাল ধরতে আসেন খোদ চানক্য নিজে। এবং চানক্য নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী হয়েই, সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এক অপরিচিত সর্দারজি অর্থমন্ত্রীকে। এর পূর্ববর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে সর্দারজি বলতে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংহ ও ইন্দিরা ঘনিষ্ঠ বুটা সিংহ'কেই দেখেছিল ভারত। সেই সময়ে ওই হালকা নীল পাগড়ি পরিহিত শিখ সর্দারজিটিকে অর্থমন্ত্রকে আসীন হতে দেখে, অনেকে একরকম অগ্রাহ্যই করেছিলেন। আমিও তাদেরই দেখাদেখি, ডক্টর মনমোহন সিংহ কে যথাযথ কদর করিনি হয়ত। নরসিমা রাও গদিতে বসেই চট করে আবিষ্কার করেছিলেন যে দেশের রাজস্ব ঘাটতি গিয়ে পৌঁছেছে আট শতাংশ'র উপরে। পরিশোধের হিসাব ও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি ও তখন বিপদসীমার বেশ উপরে। আর সেই আসল সময়টিতেই দেশের হাল ধরেন ওই হালকা নীল পাগড়ি পরিহিত শিখ সর্দারটি। সে হেন অর্থনৈতিক সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করার "মনমোহিনী অর্থনীতির" বিবরণ ও বিশ্লেষণ না হয় দেওয়া যাবে অন্য কোন কিস্তি'তে। তবে মনমোহনের নিয়ে আসা সমাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থার আমূল পরিবর্তন থেকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক তন্ত্র ও প্রণালীতে আমাদের 'নামেই কম্যুনিস্ট' বাঙালী সম্প্রদায় কিন্তু বেশ ক্ষুব্ধই হয়ে পড়েছিল। কথায়ে বলে, "কলকাতা আছে কলকাতাতেই"। কিন্তু শুধু কলকাতা নয়, সে সময়টি সারা পশ্চিমবঙ্গ পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গতেই। সে নব্বই দশকের গোড়ার দিকের অর্থনৈতিক বিপ্লবে গুজরাত ও মহারাষ্ট্র তো বটেই, এমনকি তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাবও হাত গুটিয়ে বসে ছিলোনা। পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট সরকারের মতন অনাবশ্যক ব্যায়সঙ্কোচ না করে, দু হাত দিয়ে লুটে নিয়েছিল বিশ্বায়নের ফায়দা।

বাকি নব্বই এর দশকে, ১৯৯২ এর ঘৃণ্য বাবরি কাণ্ড ছাড়া আর সেরকম কিছু মনে রাখার মত উল্লেখযোগ্য ঘটনা না থাকলেও, দুটি বিষয় মন থেকে ঠিক বাদ দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছেনা। এক, ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের "হাং পার্লামেন্ট"। খুব সম্ভব, জীবনে প্রথমবার সেই হাং পার্লামেন্ট কথাটি শুনি বা পত্রিকায়ে পড়ি। ওরকম বিচারবুদ্ধিহীন খণ্ডিত জনাদেশ দেখে গোটা দেশ খুব হকচকিয়ে গিয়েছিল। ন্যাশনাল ফ্রন্টের (নাকি তখন নাম ছিল ইউনাইটেড ফ্রন্ট?) তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল জ্যোতিবাবুকে। আর সিপিএম পলিটব্যুরোর কতকটা হাস্যকরভাবেই রাতের অন্ধকারে সিদ্ধান্তে এসেছিল সরকারে যোগ না দেওয়ার। সাধে বলে, "ঐতিহাসিক ভুল"। (আমি তো বলি, ঐতিহাসিক নয়, কেবল মাত্র 'হাসিক' ভুল বললেই চলবে)। কলকাতাও রয়ে গেল কলকাতাতেই আর আর একবারের জন্য প্রমান হয়ে গেল "রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি"। দুই নম্বরটি বিষয়টি অবশ্য রাজনৈতিক নয়। বরং আমার ও আমার সমবয়স্ক ও পরম বন্ধুস্থানীয় এক মামার কাছে একটি চরম লজ্জাবহ দিন (নাকি রাত?)। ১৯৯৬ এ ইডেন গার্ডেনসে, সচিন আউট হয়ে যেতেই, শ্রীলঙ্কা'র কাছে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পরাজয়, আমাদের দুজনের মনেই খুব গভীর গ্লানি দিয়ে গিয়েছিল। তবে যতদুর মনে পড়ছে, প্লাস্টিকের বোতল কিন্তু আমি বা আমার মামা, কেউই ছুড়ে মারিনি মাঠের দিকে। বরং চরম নিন্দাই করেছিলাম ইডেনের জ্ঞানহীন দর্শকের।

১৯৯৩ থেকে নিয়ে ৯৬ এই চারটি বছর আমার জীবনে রোববার বলতে কিছু ছিলনা। সিএ ইন্সিটিউট এর গাধার মতন সানডে টেস্ট, ইন্টার, ফাইনাল ও অফিসের নানান কাজে ঘনঘন বাইরে যাওয়া, এইসব নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম খুব। ওই পুরো সময়টা জুড়েই বোধহয় ছিল আমার নিজেকে গড়েপিটে নেওয়ার পালা। ফালতু

পদ্যফদ্য না লিখে বেশ মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম। আর একটা অদ্ভুত পরিবর্তনও এসে পড়েছিল চট করে। অফিসের কাজ, অ্যাকাউন্টেন্সি ও অডিটের পড়াশুনা ছাড়াও খুব সহজেই ইংরেজি বলতে শিখে গিয়েছিলাম তখন আমি। বাড়িতে অবশ্য তখনও নিয়মিত আনন্দবাজারই আসে, স্টেটসম্যান শুধু রোববারে রোববারে।

১৯৯৭ সাল থেকে ভালরকম অফিসের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে, কাগজকলমের নির্ধারিত সময় সকাল সাড়ে ন'টা লেখা হলেও, কলকাতার শতকরা আশি শতাংশ বেসরকারি কর্মচারী অফিসে পৌঁছতেন দশ'টার আশেপাশেই। অফিসে পোঁছে প্রথমেই চাই একপ্রস্থ চা-কফি আর তারপরে একটি দুটি শুকনো গপ্পগুজব করে, তবেই কাজ শুরু হত। নিম্নপদস্থ কর্মীদের মীটিং-ফিটিং খুব একটা নিয়মিত কিছু করতে হতোনা। খুব বেশি হলে সাহেবের ঘরে ডাক পরত সপ্তাহে বার দুয়েক। প্রতিদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ, মিনিট চল্লিশেকের ছোট একটি লাঞ্চব্রেক। খুব বেশি ফলাও না করে হলেও, বেশির ভাগ সবাইকে যেতে দেখতাম ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'র সামনের ডিম-পাউরুটি, গিলান্ডার হাউসের নিচে কাফে দ্যা প্যারি'র মোগলাই পরোটা বা আফগানি কাটলেট, অ্যান্ড ইয়ুলের রাস্তায়ে গুজরাতি দোকানের মশলা দোসা, ইডলি অথবা ডানকান হাউসের সামনে দিলীপ'এর চাউমিন খেতে। আবার কোন কোন দিন আমাদের বড়সাহেবের ইচ্ছে হলেই সবাই দল বেঁধে যেতেন ব্রেবর্ন রোডের মটন বিরিয়ানি আর তৈলাক্ত কিমাকারি সাঁটাতে। দুপুরবেলাটা কিন্তু ঘাড় গুঁজে শুধু গুরুগম্ভীর কাজ, সাথে এক দুই বার নিয়মানুযায়ী চা-কফি। সন্ধ্যে বেলায়ে ছ'টা নাগাদ অফিস ছুটি হয়ে গেলেও, একটি সাধারণ নিয়মমাফিক দিনেও, কার্যত বেড়িয়ে পরতে কিন্তু হয়ে যাবে সন্ধ্যে সাত'টা সাড়ে সাতটা। কর্মব্যস্ত দিনগুলিতে তো আরও একটু বেশি বিলম্ব হতেই পারে। এ নিয়ম, পুরুষদের জন্য খাটত বেশি। মহিলারা একটু আগে বেড়িয়ে গেলে প্রশ্ন উঠত যথেষ্ট কম। অবশ্য কাঁটায়ে কাঁটায়ে ছটা'য়ে যদি কাউকে কোনদিন ব্যাক্তিগত কাজে বেড়িয়ে পরতে হয়, তবে সাহেবকে একটু আগে থেকেই মায়ের কিমবা বাবার শরীর-টরীর নিয়ে বা অন্য কৃত্রিম কিছু যুক্তি বলে রাখা ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এদিকে সকালের দশটা'টি সাড়ে দশটা হলেও মারাত্মক ক্ষতির কিছু নেই, অথচ বেরোনোর সময়'টি ছ'টা সোয়া ছটা'র আশেপাশে হলেই, দু চারজন বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী ঠিক বেরোনোর মুখেই মুচকি হেসে তীব্র কটাক্ষ করতেন, "কি হে খোকন? আজ কি তোমার হাফ-ডে ছিল নাকি"? নব্বই দশকের শেষের দিকেও কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ার চত্তরে, অর্থাৎ জিপিও, রাইটার্স বিল্ডিং, মিশন রো, স্ট্র্যান্ড রোড, স্টিফেন হাউস, ফেয়ারলি প্লেস, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এইসমস্ত এলাকার বেসরকারি অফিসগুলিতে, এরূপ দৈনন্দিন কর্পোরেট বক্রোক্তি ছিল একেবারে মার্কামারা। আশ্চর্যজনকভাবে, কলেজ থেকে সোজা ওইধরনের পরিবেশে গিয়ে পড়ে, খাপ খাওয়াতে কিন্তু আমার কোনদিনই খুব একটা অসুবিধে হয়েছিল বলে তো মনে পরছেনা। বরং ওই পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়ে, কাঁচা বয়েসেই বেশ করিতকর্মা ও একইসঙ্গে বেশ অকালপক্ক হয়ে উঠেছিলাম আমি। ওই বয়েসেই বেশ বুঝে নিয়েছিলাম যে নিয়মানুসারে, ওইসব বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের উপহাসের কোন যথার্থ উত্তর দিতে হয়না। লোক বুঝে, হয় অল্প একটু স্মিত হাসি বা আবার কারো কারো ক্ষেত্রে পালটি উত্তর দিতে হয়, "কি যে বলেন দাদা, আজ সকাল থেকেই পেটটা ভাল যাচ্ছিলোনা, আজ তো ছুটিই নিয়ে নিয়েছিলাম। সাহেব অত করে বললেন বলে 'ক্লোরস্টেপ' খেয়ে চলে আসতে হল।"। আবার কোন জায়গায়ে একটু অকারণ ঝাঁঝিয়ে, প্রত্যুত্তরে চরম বিরক্তিভরে বলে দিতে হত, "আপনার কি দরকার মশাই? নিজের কাজ করুননা..."।

অফিসে খুব সহজেই শিখে নিয়েছিলাম কোন পুজোয়ে কি ফুল লাগে। কোন লোক ঠিক কিসে পরিতুষ্ট হবেন, কাকে একটু এড়িয়ে চলতে হবে আর কার সাথেই বা আক্রমণাত্মক মারমুখি ব্যাবহার জরুরি, সে পরিপক্কতা এসে গিয়েছিল খুব গোড়ার দিকেই। এর পিছনে ভাল স্মৃতিশক্তি এবং অ্যাকাউন্টেন্সি ও অডিটের প্রয়োগিক জ্ঞান ছাড়াও, এই মাঝবয়েসে এসে, আমি কয়েকটি উপযুক্ত কারণ খুঁজে পাই। যেমন আমার কাজ শেখার ও করার তীব্র উৎসাহ ছাড়াও আমার নিরহঙ্কার ও সঙ্গতিহীন বাল্যকাল আমাকে প্রতিনিয়ত ভাল কাজ করে যাওয়াতে অনুপ্রাণিত করত অনেকটাই। আরও একটি অদ্ভূত কারণ আছে, যেটি কিনা এখন ভাবলে ঈষত তুচ্ছ বলে মনে হয়। তবে কারণটি খুবই ন্যায্য ও তাৎপর্যময়। সেটি আমার স্বভাবসুলভ 'অনুকরণ' করবার অভ্যাসটি। কৈশোরে ও যুবাবয়েসে অনুকরণ করাটা ছিল আমার কাছে বড় সহজাত। ভাল হাতের লেখা, গান, আবৃত্তি, কারো কোন স্বাতন্ত্র্যসূচক মুখভঙ্গি বা অন্য কোন বিচিত্র অভ্যাস তো বটেই, এমনকি বড়সাহেবদের কাজ করবার রকমসকমও খুব সহজেই মনে গেঁথে যেত। (কিন্তু অনুকরণ বলতে বড় কোন

কমেডিয়ানদের মতন অত নিখুঁত বা নির্ভুল নকল করতে পারতামনা কোনওসময়েই। শুধু কেবলমাত্র সূক্ষ্ম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব, ভাঁড়ামির দোষ কেউ দিতে পারবেন বলে তো মনে হয়না)।

অফিসে সবার সবটুকু ভাল জিনিসটি নকল করেই, মক্কেলদের সাথে মোটামুটি কুটুম্বিতা বজায় রেখে, পরপর দুবছর উৎকৃষ্ট রেটিং পেয়ে আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িক স্থানান্তরণের জন্যে। আমার বাবার দিকের গোটা পরিবারে সেই বোধহয় প্রথম কারোর বিদেশযাত্রা। মা বাবা তো বটেই, এমনকি আমার স্বর্গত শ্বশুরমশাই ও শাশুরি'মাও চরম আনন্দ পেয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। ১৯৯৯ এর ডিসেম্বর মাস থেকেই গরম কাপড় যোগাড়যন্ত্র ও আমেরিকার সুলুকসন্ধান ও অন্য বিভিন্ন তৈয়ারি হয়ে গিয়েছিল শুরু।

দুহাজার সালের জানুয়ারির মাসের ষোল তারিখ, ‘রোববার’, ফিলাডেলফিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানটি অবতরণ করেছিল মোটামুটি ঠিক সময়েই। বেলা আন্দাজ পৌনে দুটো নাগাদ। পথে বিমানের টিভি পর্দার সঙ্গে হাতঘড়ি মিলিয়ে নিয়েছিলাম দুবার। একবার হিথরোয়ে নামার আগে আর দ্বিতীয়বার ইউরোপ ও আমেরিকার ঠিক মধ্যিখানে, এক্কেবারে অ্যাটলান্টিকের উপরে। যদিও ইচ্ছে করেই বিমানের মাঝামাঝি জানালার পাশে জায়গা নিয়েছিলাম, কিন্তু ওই লন্ডন ফিলাডেলফিয়া’র দ্বিতীয় পর্বের সফরটি’র প্রায় পুরো সময়টি চোখ বন্ধ করেই রেখেছিলাম। বাইরে তখন কি চলছে - সকাল না দুপুর, দিন নাকি রাত্রি, আলো নাকি ঘোর অন্ধকার, কেন জানিনা কোন কৌতুহলই ছিলনা আমার মনে। কাজের মধ্যে শুধু কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটিবার মাত্র, আধখানা চোখ খুলে সামনের বড় টিভি পর্দায়ে সময় দেখে নিয়েছিলাম আর অজান্তেই ঘনঘন বুকপকেটে হাত চলে গিয়েছিল, আমার সদ্য বানানো অশোকস্তম্ভ দে'য়া পাসপোর্ট'টি সুরক্ষিত আছে কিনা দেখে নিতে। চোখ বন্ধ করে রাখলেও ওই টানা সাড়ে সাত-আট ঘন্টার অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিতে, ঘুমোতে পারিনি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও। ঘুম আসেনি। চোখ বন্ধ করেই ফ্ল্যাশব্যাকের মত ঝালিয়ে নিয়েছিলাম লন্ডন হিথরোয়ে চোদ্দ ঘন্টায় হয়ে যাওয়া সব আজব অভিজ্ঞতাগুলি। হিথরোর ওই মোট চোদ্দ ঘন্টায় ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সব একই সঙ্গে অনুভব করে, যেন একটু অবসন্নই হয়ে পরেছিলাম। অমন বিলাসবহুল হিথরো বিমানবন্দর, অমন দারুণ শৌখিন, ঐশ্বর্য ও প্রাচূর্য মণ্ডিত ডিউটি ফ্রী সমস্ত বিপণি আমি আগে কখনও দেখিনি। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দেখেশুনে আমি একেবারে প্রায় সম্মোহিতের মত হয়ে পরেছিলাম। কত ধরণের রেস্তরাঁ, কত কফিশপ, কতরকম শুধু স্যান্ডুইচেরই নমুনা। পকেটে ছিল কোম্পানির দেওয়া পাঁচশো ডলার, দুশো ক্যাশ আর বাকিটা ব্যাঙ্কের ট্র্যাভেলর্স চেক। দুর্ভাগ্যবশত টানা ওই চোদ্দ ঘন্টা কাটিয়েও, হিথরোয়ে সে ডলার, পাউন্ড স্টারলিং এ ভাঙ্গাতে পারিনি সাহস করে। স্টেটসম্যান পত্রিকা পড়লেও, ঝরঝরে ইংরেজি বলতে পারলেও আমার বাঙালীত্ব, অকারণ উটকো ভয় ও হয়ত কতকটা তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক সুলভ অবাঞ্ছিত হীনমন্যতাই কাজ করেছিল আমার মধ্যে।

জীবনে প্রথমবার হিথরো দেখেই কিনা জানিনা, একটি ভয়ঙ্কর চাপা উত্তেজনায়ে স্নায়ুগুলি যেন বড় বেশি রকমের চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। মনটি হয়ে গিয়েছিল বড় ভারী, নীরস ও স্থুলবুদ্ধি। আনন্দ ও আশঙ্কা’র এমন কিম্ভুত জগাখিচুড়ি আগে কোনদিন কখনও অনুভব করিনি। তবে ওই দ্বিতীয়দফার হিথরো ফিলাডেলফিয়ার বিমানযাত্রায় আনন্দ ছিল কম, আশঙ্কা'র ভাগই তুলনামূলক ভাবে বেশি। বিমানে খেতেও দে'য়া হয়েছিল দুবার। কিছু খাবার ছিল একদম অচেনা, আগে খাইনি কোনকালে। কলকাতা হিথরোর বিমানের মতন ভারতীয় খানা নয়। তেমন সুস্বাদু কিছু না লাগলেও, গরু-টরু কিছু নেই জেনে, পুরোটাই খেয়ে নিয়েছিলাম মুখ বুজে। ফিলাডেলফিয়া পৌঁছানোর আধঘন্টাখানেক আগে বিমানের ক্যাপ্টেন যখন নিয়মমাফিক অবতরণের ঘোষণা করলেন তাঁর খাস মার্কিনী নাঁকি উচ্চারণে, ঠিক কি বলছেন প্রকৃতরূপে বোধগম্য না হলেও, আশেপাশের যাত্রীসকল যে সহসা সামান্য তৎপর হয়ে উঠেছেন, তা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। পার্শ্ববর্তী সীটের জনাকয়েক সাহেব মেমসাহেবের মুখে দেখেছিলাম ঈষৎ স্বস্তির ছাপ। স্বদেশাভিমুখে যেমনটি হয় আরকি। অবতরণের আগে, প্রায় মিনিট দশেক ধরে বিমানটি যখন মাটির মাত্র হাজার তিন-চারেক ফুট উপরে চক্কর কাটছিল, তখন দেখে নিয়েছিলাম সাদা বরফে ঢাকা প্রশস্ত রাস্তাঘাট ও সুবিশাল দৈত্যের মতন ঝাঁ চকচকে পর্বতপ্রমাণ কিছু অট্টালিকা। ঘোরার মুখের অন্যদিকটিতে আবার বরফ কম, খানিক সবুজ মাঠ, দু তিন খানি নদী বা জলাশয়ও দেখতে পেয়েছিলাম। সব

মিলিয়ে এটকুই তখন বুঝেছিলাম যে এ দেশ আমার দেশের মতন এলোমেলো নয় এক্কেবারে। অনেক সাজানো, অনেক গুছানো, একদম একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডারে আঁকা ছবির মতন। এত চমকপ্রদ সুন্দর দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল তক্ষুনি একটানে একটা ছবি এঁকে ফেলি। সামান্য সাহস ফিরে এসে গিয়ে তখন অনেকটাই সাবলীল আমি। একটু সাবধানী হয়ে তখন বিমান থেকেই অধীর হয়ে দেশটিকে ঠাহর করছি আর মনে মনে দিবাস্বপ্ন দেখছি আর ভাবছি, ইশ! আমার নাম যদি অনির্বাণ না হয়ে 'কলম্বাস' হত। এদেশ যদি আমিই পারতাম প্রথম আবিস্কার করতে, এই সমস্ত নানা অবাস্তব অলীক কল্পনা আরকি। আচমকা একটা ছোট্ট ঝাঁকুনির সাথে সুবিশাল বোয়িং বিমানটি সমতল ছুঁতেই, সে সব উদ্ভট কল্পনার অবসান। বিমানটি মাটি ছুঁতেই, মনের মধ্যে হঠাৎ একটু সহজাত ফিচলেমি করে ভেবেছিলাম, শালা! বঙ্কিমবাবুর গণনাই অভ্রান্ত। উনিই বলেছিলেন কিনা, এ ছেলের দ্বাদশ ঘরে লগ্ন, বিদেশভ্রমন আছেই আছে... দেখলে তো, এদিক সেদিক করে, ঠিক একদম 'আমেরিকা' পৌঁছে গেলাম।

ছবি আঁকার কথায়ে হঠাৎ মনে পড়ছে, ভালো ছবি আঁকতে পারিনি কস্মিনকালেও। ইশকুলে ড্রয়িং'এ চিরকাল গোল্লাই পেয়ে এসেছি। আর এ নিয়ে আমার মনে খেদও আছে বেশ। চিন্তার ভিতর নানা সুন্দর ছবি সিনেমার ফ্রেমের মত ঘুরেফিরে আসলেও আর তার সুস্পষ্টভাবে মৌখিক বর্ণনা করতে পারলেও, কেন যে সেগুলি এঁকে ফেলতে পারতামনা, কে জানে? একসময় সে নিয়ে খুব কসরত করেছি ছেলেবেলায়ে। ছেলেবেলায়ে আমার ড্রয়িং খাতায়ে আঁকা বলতে, একমাত্র বিষয় ও সম্বল ছিল সারা পাতা জুড়ে আঁকা একটি সবুজ ফুটবল মাঠ ও তাতে একটি খয়েরি গোলপোস্ট। গোলকিপার মাটির একটু উপরে সমান্তরাল রেখায়ে। হাত দুটি প্রসারিত করেও গোলটি বাঁচাতে পারলেননা। বলটি গোলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে আর অন্যদিকে গোলদাতা একটি পা সামান্য তুলে গোলমুখে শটটি নিলেন এইমাত্র। উল্লেখ করা আবশ্যক যে ছবিটির মধ্যে গোটগোট করে ফেল্ট পেনে লেখা থাকত গোলকিপার ও গোলদাতাটির নাম। গোলকিপারটি ছিলেন মোহনবাগানের শিবাজি ব্যানার্জি, সবুজ রঙের এক নম্বর লেখা ফুলহাতা জার্সি পরা আর গোলদাতাটির পড়নে আমার গর্বের, অম্লান ও ঝকঝকে লাল-হলুদ। পনের নম্বর জার্সিতে বিখ্যাত সুরজিত সেনগুপ্ত। উদ্দেশ্যটি বেশ উদ্ধত হলেও, সৃষ্ট বস্তুটি হত খুবই কাঁচা ও অদক্ষ হাতের একটি আঁকা। জলরঙ ধেবড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। ছবির কোনায়ে আবার সদম্ভে স্কোরও লেখা থাকত "ইস্টবেঙ্গল ১ –মোহনবাগান ০"। আঁকাটির থেকে কলকাতা লিগের বড় ম্যাচের স্কোরটির বিশেষত্ব আমার কাছে সে ছবি আঁকা বয়েসে ছিল হাজার গুন বেশি। কেউ কিছু আঁকতে বললেই, ওই একই একঘেয়ে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান এঁকে দিতাম আমি।

আঁকা নিয়ে এরকম মজার গল্প আমার আরও বহু রয়েছে। যেমন একবার তো সেই একটা ঘরোয়া 'বসে আঁক' প্রতিযোগিতায়ে আমি আর আমার ছেলেবেলার বন্ধু শুভ্রশেখর আশ্চর্যজনকভাবে এঁকে দিয়ে এসেছিলাম সান্যাল চ্যাটার্জি'র জীবনবিজ্ঞান বই থেকে নেওয়া মানব শরীরের পাচনপ্রণালী'র আবোল-তাবোল ছবি বা ওইরকমেরই হাবিজাবি কিছু । শুভ্র আবার আমাকে টেক্কা দিতে গিয়ে বা হয়ত একটু লজ্জা পেয়েই, শেষ মুহূর্তে ঘ্যাঁচ করে একটা ঢ্যাঁড়া দিয়ে কেটে, একটা পেন্সিল কম্পাস দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে আঁকার চেষ্টা করছিল পরমহংসদেবের এক প্রতিকৃতি। এককথায়ে সে এক চরম লোকহাসানো যাচ্ছেতাই কাণ্ড। আমার আঁকার সে সব টুকরো টুকরো কাণ্ডজ্ঞানহীন অতীত ভাবলে এখন চরম গম্ভীর সময়েও ভালরকম হাসি পেয়ে যায়।

তবে ছবিটবি ভাল আঁকতে না পারলেও, আমার কল্পনাশক্তিটি কিন্তু ছিল মোটামুটি চলনসই। কোনো অজানা অচেনা জায়গায়ে যাওয়ার আগে, সে জায়গাটি কেমন হবে, কেমন দেখতে হতে পারে, সে নিয়ে মনশ্চক্ষুতে কল্পনা করে সময় কাটিয়েছি অনেক। তা সে পাইকপাড়ায়ে পিতৃবন্ধু কানাই কাকুদের বাড়িই হোক বা ডায়মন্ড হারবারের হোটেল সাগরিকা। এছাড়াও মাঝে মাঝে ভুগোল বা ইতিহাস পাঠ্যবই'য়ে দে'য়া ছবি আর আমার বাবার তোলা রকমারি সাদা কালো ফোটোগ্রাফ দেখে পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, গ্রাম, নদী, কিরকম দেখতে হতে পারে, সে নিয়ে একটি ভাষাভাষা ধারণা তো একরকম আমার হয়েই গিয়েছিল। আর মনশ্চক্ষুতে অজানা জায়গা কল্পনার রোমান্টিসিজম আমার খুব বেশিমাত্রায় ছিল। (এখন যেমন অজানা কোনোকিছুই দুম করে 'গুগল' করে নেওয়া হয়, সে ব্যবস্থা আমাদের ছেলেবেলায়ে ছিলোনা কিনা)। তারপর আসল জায়গাটি চর্মচক্ষুতে দেখে, কল্পনার সাথে মোটামুটি মিলে গেলেই, একধরনের সফলতাই অনুভব করতাম আমি। তবে যতদুর ভেবে মনে পড়ছে, নতুন জায়গা কিম্বা

কোনো নতুন পরিবেশ বা কোনরকম অবিশ্বাস্য কিছু দেখে, কল্পনার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে, নিজের কাছেই নিজে আবেগপ্রবন ও অপ্রস্তুত হয়েছি অনেকবার। নিজের মানসিক প্রত্যয় ও কল্পনারশক্তির উপরে আস্থা রেখে ডাহা ফেল মেরেছি কিছু না হলেও কম করে দেড়শ দুশো বার।

মনে পড়ছে, খুব ছেলেবেলায়ে একটি শীতের সকালবেলা, পুরী রেলস্টেশন থেকে সাইকেল রিকশা করে দাদুর কোলে চেপে প্লাজা হোটেলে যাওয়ার সময়টি। সালটি মনে পড়ছেনা, সে ১৯৭৬ / ৭৭ ই হবে বোধহয়, কিংবা ৭৮ / ৭৯ ও হতে পারে। পুরী বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল মামাবাড়ির সকলের সাথে। আর যাবার আগে 'বন্ধুমাস্তু'র কোলে বসে চুপটি করে শুনেছিলাম পুরী সংক্রান্ত অসংখ্য গল্প। আর সে সব শুনেই, মনের মধ্যে কল্পনায় তৈরি হয়েছিল সমুদ্র, বালি, নুলিয়া-টুলিয়া নিয়ে একটি একান্ত নিজস্ব ধারণা। আর সেই ধারণা যে কিভাবে এক লহমায় চুরমার হয়ে গিয়েছিল, তা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে এখনও। এখন না হয় এই বয়সে, সময়ে অসময়ে, বারদশেক পুরী গিয়ে গিয়ে, তাও সামান্য বোধহয় ধাতস্থ হতে পেরেছি। তবে সত্যি বলতে পুরীর কাছে প্রথমবার ফেল মারবার মজাই আলাদা। রেলস্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে, বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি এসে পড়লেই, অজান্তেই গায়ে এসে লাগবে একটা বিশেষ ভেজা ভেজা হাওয়া আর আরও একটু কাছাকাছি এলেই নাকে এসে লাগবে একটা বিশেষ নোনতা ঘ্রাণ। সাইকেল রিকশাটি বেশ খানিকটা সোজা গিয়ে আকস্মিকভাবে ডানদিকের রাস্তায়ে স্বর্গদ্বারের দিকে মুড়লেই দেখা যাবে ডান হাতে সারি দিয়ে হোটেলগুলি আর বাঁদিকে তাকালেই মাথা যাবে ঘুরে। এক বিরল বিস্ময়। সমুদ্র যে কত বড় হতে পারে, কত নীল, কত সুন্দর, কত সুবিপুল ও একইসাথে কতটা দুর্বিনীত হতে পারে, সে ছেলেবেলায় যে পুরী না দেখেছে, সে বুঝে উঠতে পারবেনা। কল্পনাশক্তিতে ওই প্রথমবারটি ফেল মেরেছিলাম পুরী'র সমুদ্র'র কাছে। একেবারে দেউলিয়া করে ছেড়েছিল, মনে আছে।

দ্বিতীয়বারটি ওই একইরকম অক্ষমভাবে ঘায়েল হয়েছিলাম আগ্রা'য় এবং সেই পরাজয় পুরী'র সমুদ্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি লজ্জার। কারণ 'তাজমহল' আমি ছবির বইয়ের পাতায়ে আগে অনেকবার দেখেছি। ইতিহাস বই'য়ে তো বটেই, এমনকি আমার জ্যাঠতুতো দিদিদের পারিবারিক অ্যালবামের ছবিও দেখেছি। সম্ভবত আগ্রা শহরের অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন পথঘাট, বেতো ঘোড়ায় টানা টাঙাগাড়ী, ইত্যাদি দেখেশুনে তাজমহলকে বোধকরি একটু কম পাত্তাই দিয়ে ফেলেছিলাম। তখন আমি নেহাতই শিশু। বড়জোর নয় কি দশ বছর বয়স হবে, তার বেশি নয়। তাজের বাইরে টিকিট কিনে, লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে, অসংখ্য বাঙালী অবাঙালি পর্যটক ও গ্রাম্য দেহাতীদের ভিড়ে, ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে, ঘ্যান ঘ্যান করে মায়ের বকুনি খেয়ে, খিদেয়-তেষ্টায় একপ্রকার অতিষ্ঠই হয়ে পড়েছিলাম আমি। শেষমেশ লাইনের শেষে, ভিড় কেটে গিয়ে হঠাৎ সামনে অমন মনোহর তাজমহলের রূপ দেখে শুধু আমি কেন, আমার বাবা মা ও আমাদের আরও সঙ্গীসাথী.. সবাই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বলেই মনে পড়ছে।

তারপর তার দুচার বছর পরে, আবার চরম বেইজ্জত হতে হয়েছিল প্রথমবার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' দেখে। টানা দুদিন ধরে মুখ দেখতে পাওয়া যায়নি তার, মেঘ-কুয়াশায় ছিলেন ঢেকে। তৃতীয় দিন দুপুরের দিকে আমি খুব সম্ভবত আমার ছোট ভাইটির দেখাশোনা করছিলাম, মা হয়ত ব্যাস্ত ছিলেন অন্য কাজে। হঠাৎ আমাদের ওই সস্তার হলিডেহোম গোছের হোটেলের জানালার পর্দা সরাতেই দেখতে পেলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভাইটিকে ফেলে একদৌড়ে গিয়ে মা বাবা এবং আরও পাঁচদশটি লোকজন কে খবর দিয়ে ডেকে এনেছিলাম আমাদের ঘরে। খুব মনে পড়ছে প্রথমবারের দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই রূপ আমার মাথার চুল অবধি খাড়া করে দিয়েছিল।

চার নম্বরের হতাশাজনক অসাফল্যটিও ঘটেছিল ওই একইসময় নাগাদ, আমার তেরো চোদ্দ বছরের বয়ঃসন্ধিতেই। ছোটবেলা'য় অজয় বসু, কমল ভটচায, পুষ্পেন সরকারের ক্রিকেটখেলার ধারাবিবরনী রেডিওতে শুনেছি অনেক। এমনকি আকাশবাণী ভবনের পাশ দিয়ে হাওড়া স্টেশনের দিকে অথবা কোনো রোববার বাবুঘাট বা উট্রাম ঘাটেও বাবা মায়ের সাথে গিয়েছি অনেকবার। আর প্রতিবারই মনে পড়ে, ওই পথ দিয়ে বাসটি গেলেই বাবা একটু বেশি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে বিশেষ করে আমাকে দেখিয়ে দিতেন জায়গাটি। আর না বুঝেই আমি প্রতিবারই স্বাভাবিকভাবে ঘাড় নেড়ে গিয়েছি। একেবারে লজ্জার মাথা কাটা গিয়েছিল প্রথমবার যখন ভিতর থেকে দেখতে পেলাম ক্রিকেটের স্বর্গ 'ইডেন গার্ডেনস'। মাঠে ঢোকার আগে, বাবার হাত ধরে, অনেক

রঙবেরঙের কাগজের টুপি যোগাড় করে, ভিড় ঠেলে যখন প্রথম দেখলাম ওই মাঠ, সত্যি বলতে অমন বেকুব আমি কোনকালেও হইনি। মাঠ আগেও দেখেছি বিস্তর... বাড়ির কাছেই ঢাকুরিয়ার কালচার মাঠ, একটু পায়ে হেঁটে গেলেই রবীন্দ্র সরোবর, বাবার অফিসের সামনেই ময়দান, এমনকি আমাদের সেন্ট লরেন্স ইশকুলের মাঠগুলিও আকার ও আয়তনে ছিল বেশ বড়। তবে ইডেন যেন সবার থেকে আলাদা। দেখে এক্কেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। ক্রিকেটখেলা না দেখে সারাটি দিন বড় আনমনা হয়েই ছিলাম বলেই মনে পড়ছে। লাঞ্চের সময় লুচি - ডিমের ডালনা, মাঝে মাঝেই কমলালেবু, বাদাম ইত্যাদি সহ ইডেনের অমন তাজ্জব রূপ, আমার বাল্যমনটিকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল ভীষণ। সেটি চতুর্থবার। ইডেনে আমি আর আমার মামা গিয়েছি অনেকবার, কিন্তু সেই প্রথমবারের ইডেন যেন আমার স্মৃতিতে একবারে বোম পেরেকের মতন গেঁথে রয়েছে।

বৃটিশ এয়ারওয়েজে'র বিমান থেকে নেমে, ভিসা পাসপোর্ট নিয়ে সক্কলের দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পরেছিলাম একটা ছোটমতন লাইনে। জনাকয়েক এশিয় দেখতে লোকজনকে দেখেই ওই বিবেচনা করেছিলাম, মনে পড়ছে। ইমিগ্রেশনে এক বিশালকায় কেঁদো কালো সাহেব দুচারখানা প্রশ্নও করেছিলেন আমাকে। চটপট সঠিক জবাব দিয়ে, জীবনে প্রথমবার ইমিগ্রেশন ও তারপরে যথাবিধি কাস্টমস চেকিং করিয়ে, বিয়েতে উপহার পাওয়া সুটকেস দুটি যোগাড় করে, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত ভাবতে গিয়ে একটু সামান্য বিহ্বল হয়ে পরেছিলাম হয়ত। কিন্তু আবার অবিলম্বে বুদ্ধি খাটিয়ে, আশেপাশের লোকজনকে হুবহু নকল করে, বিমানবন্দরের বাইরে এসেই চমকে গেলাম জীবনে পঞ্চমবারটির জন্য। অপরাহ্নের মাইনাস চার-পাঁচ ডিগ্রির কনকনে ঠান্ডায় গোটা ফিলাডেলফিয়া শহরটি যেন তখন আমাকে গিলতে আসছে এক মহাকায় দানবের মতন।

ফারেনহাইট আর সেন্টিগ্রেডের হিসেব করতে করতে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই ঠাণ্ডাটা খুব একটা বুঝে উঠতে পারিনি সেই রোববার। সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টিটু বাই নাইন – ক্লাস সেভেন এইটে শেখা ফরমুলাটি যে এইভাবে মুহুর্মুহুর কাজে লাগতে পারে, সেটি ভাবতে ভাবতেই কোম্পানির গাড়িতে চেপে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমার বাসস্থানে। শহরের কেন্দ্রস্থলে রিটেনহাউস স্কোয়ারের 'করমানসুইটস হোটেল'। সত্যিকারের বিদিশি গাড়িতে প্রথমবার চেপে কেমন লেগেছিল, চালকের ডানপাশে বসতেই বা কেমনতর অভিজ্ঞতা, শহর আর তার দুপাশে বরফে ঢাকা রাস্তাঘাটের বর্ণনা, ইয়াহু ম্যাপের সাহায্য নিয়ে গাড়িচালক কিভাবে কাউকে না জিজ্ঞাসাবাদ করেই আমাকে সটান নিয়ে গেলেন করমানসুইটসে, সেই সব কাহিনী, এই বিশ্বায়নের যুগে, স্মার্টফোন, গুগল আর ইউটিউবের আমলে শুনিয়ে পাঠক পাঠিকাদের বিরক্তি বাড়াবো না। সুসজ্জিত দুকামরার এপার্টমেন্টটির বিবরণ, রান্নাঘর-বাথরুম, ওয়াশিং মেসিন, মাইক্রোওয়েভ ও ক্ষণেক্ষণে আরও অনেক বিস্ময়ের গল্প নাহয় শোনাবো অন্য কোনদিন, অন্য কোনখানে। বেশি কিছু না বলে বরং, এটুকুই বলা যায় যে ছয় নম্বর পরাজয় থেকে নিয়ে দুশো নম্বর পরাজয়টিও হয়ে গিয়েছিল ফিলাডেলফিয়ার ওই এক রোববারের সন্ধ্যেবেলাতেই। কোথায়ে আমার বালিগঞ্জ ফাঁড়ি'র বিকেলের চায়ের দোকান, কোথায়ে গেল আমার বাবার সাথে হাত ধরে রোববারের ঢাকুরিয়া বাজার পরিক্রমা, কোথায়ে গেল আমার রোববারের সকালে বাবার সাথে বসে স্টেটসম্যান পাঠ, কোথায়ে গেল আমার পদ্যলেখা আর কোথায়েই বা আমার জীবনসঙ্গিনীটি?

কাশফুলের মাঠে, জীবনে প্রথমবারের জন্য রেলগাড়ি দেখতে অপু'র সঙ্গে তো তাও দুর্গা ছিল, আর এখানে? এখানে তো 'অপু' একা। ভয়াতুর হয়ে আমি ইলেকট্রিক ওভেনে তখন বাড়ি থেকে বয়ে আনা একটু চালডাল ফুটোতে ব্যাস্ত। দণ্ডে দণ্ডে নিজেকে অভিসম্পাত দিয়েছিলাম, কেন যে দুম করে না বলেকয়ে, নিষ্প্রয়োজনে কেন যে অহেতুক সাড়ে নয় ঘন্টা পিছিয়ে আমেরিকায়ে মরতে এলাম? মাঝ সন্ধ্যার ফিলাডেলফিয়ার করমানসুইটসের জানালার বাইরের কোটি কোটি নিয়ন আলো তখন আমাকে বড্ড বেশি কাঁচুমাচু ও বড্ড অনিশ্চিত করে ফেলেছে।

সেই বোধহয় জীবনের প্রথম রোববার, যেদিন মায়ের সাথে কথাই হলনা সারাদিন।

ক্রমশ...